জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (জীবনী ভিত্তিক) উপর রচনা প্রতিযোগিতাঃ

নাম ঃ **লাইলাতুল আজমী তানহা**

বিভাগ : সরকার ও রাজনীতি

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০

মেধাক্রম : ০১

কভার পৃষ্ঠা:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত মহান স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (জীবনী ভিত্তিক) উপর রচনা প্রতিযোগিতা।

নাম	শ্রেণি	বিভাগ	শিক্ষাবর্ষ	শ্রেণি রোল	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শণ
ও
বর্তমান বাংলাদেশ

সংকেত:

- উপক্রমনিকা।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন।
- বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন গড়ে উঠার পটভূমি।
- বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও বর্তমান বাংলাদেশে এর প্রভাব এবঙ গুরুত্ব।
- বর্তমান বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়সমূহ।
- বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ।
- উপসংহার।

উপক্রমণিকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, তিনি আমাদের চেতনা, গৌরবের অধ্যায় এবং তিনিই আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি। তিনি আমাদের জাতির জনক যার জন্ম এ দেশে হয়েছিল বলে আমরা গর্বিত। তিনি বায়ান্নর ভাষাসৈনিক এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। তার সম্মোহনী নেতৃত্ব আমাদের মুক্ত করেছিলো পাকিস্তানি নরপশুদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তার সাহস, তার চেতনা ও আদর্শ আজও আমাদের উদ্বুদ্ধ করে সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, দেশ ও জাতিকে ভালোবেসে প্রাণ ত্যাগ করতে। তারা রাজনৈতিক দর্শন ছিল গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজের সকলের কল্যাণের জন্য। তার এই জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দর্শন তাকে জীবদ্দশায় করে তোলে কিংবদন্তি। তাইতো আজও তার রাজনৈতিক দর্শনসমূহ আমাদের সকল অশুভ স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা যোগায়। তার দর্শনগুলো চিরজীবন্ত থাকবে আমাদের অন্তরে এবং কাজ কর্মে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মাঝে না থাকলেও তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে তার রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শন ছড়িয়ে পরবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এবং যতদিন আমরা এ আদর্শকে ধারণ করব ততদিন পধ হারাবে না আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন এ দেশের মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। কখনো এদেশের জনগণের স্বাধীনতার জন্য আবার কখনো স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একটি গণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লড়াই করেছেন। তাইতো তিনি এ দেশের মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ও রাজনীতির কবি হিসেবি স্বীকৃত।

১৯৭১ সালের আগে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ছিল মূলত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন মানচিত্র। কিন্তু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ছিল একটি গণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং এদেশের আপামর জনগণের মুখে হাসি ফোটানো। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু একই দিনে রমনার বিশাল জনসমুদ্রে ঘোষণা দেন,

"বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে,
আর এর ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না,
রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা"

অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ছিলো একটি ধর্মনিপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তিনি শোষিতের গণতন্ত্র স্থাপন করতে চেয়েছেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের

সংবিধান প্রণীত হওয়ার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর এক অনন্য সাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর, এ ভাষণটিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য এক ভাষণ যেখানে তার রাজনৈতিক দর্শন, আদর্শ ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু 'গণতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ব্যাখ্যাঃ

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন ব্যাখ্যা দেন। ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন,

"ধর্মনিরপেক্ষতা মান ধর্মহীনতা নয়।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে।

আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাইনা এবং করবো না"।.....

অর্থাৎ তিনি কারো ধর্ম পালনে বাধা দেননি। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলের যার যার ধর্ম পালন করার অধিকারের নিশ্চয়তা তিনি দেন। বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে আরও বলেন,

"আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে খুন, জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ-অত্যাচার, ধর্মের নামে বেইমানি। এই বাংলার মাটিতে এসব চলেছে। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়েগ সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে".....।

বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে স্পষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তার অবস্থান তুলে ধরেন। এই ধর্মনিরপেক্ষতা ও পশ্চিমাদের সেক্যুলারিজম এক নয়। বঙ্গবন্ধু ধর্মহীনতা নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। শুধু রাষ্ট্র ও রাজনীতি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষা থাকে, কোন বিশেষ ধর্মকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তিনি মূলত বাঙালি জাতি যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং ধর্মের কারণে ভাগ না হয় তাই এ দর্শন তুলে ধরেন।

ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

"ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা এবং ধর্মের নাম হানাহানি এবং ধর্ম ব্যবসা বন্ধের জন্যই এ নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন। এতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুই-ই নিরাপদ থাকবে"

সেই সময়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যায় অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা ওআইসির সদস্যপদ গঠন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন ইত্যাদির সমালোচনা করেন। পশ্চিমে সেকুলারিজমের অর্থ আর বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা এক নয়। ইউরোপ–আমেরিকাতে সেকুলারিজমে কোনো সংস্কারেই বিশ্বাস হয় না, শুধু ইহজাগতিকতায় বিশ্বাস রাখা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেকুলারিজমে ধর্মের অনেক স্পেস ছিল। তিনি পশ্চিমাদের মতো সেকুলারিজম চাননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু চেয়েছিলেন ধর্মের নাম মানুষের অধিকার হরণ, অত্যাচার, নির্যাতন, রাহাজানি বন্ধ হোক।

বাঙালি জাতির মাঝে ঐক্য থাকুক। ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের মাঝে বিভেদ তৈরি করতে না পারে। ধর্ম আর রাজনীতি যেন এক না হয়। কারণ বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের মনোভাব সম্পর্কে জানতেন।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যাঃ

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ৪ নভেম্বরের ভাষণে বলেছেন,

“আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি।.....

আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন করে আনতে চাই না। এক এক দেশ এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ।.....”

বঙ্গবন্ধু মূলত একটি শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার মহান লক্ষ্য নিয়ে সমাজতন্ত্রকে সংবিধারে মূলনীতি হিসেবে যুক্ত করেন। পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের শোষণ, অত্যাচার থেকে দেশের কৃষক, শ্রমিকসহ শ্রেণীবৈষম্যের স্বীকার মানুষকে মুক্ত করতে এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট না হয়েও যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাস করা যায় এটি তার ভাষণে স্পষ্ট।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গন্ধু তার ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে লিখেছেন,

“আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়াতে থাকবে ততদিন মানুষের উপর শোষণ বন্ধ হবে না”.....।

অনেকে বলেন, ১৯৭২ এর সংবিধানে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র যুক্ত করেছেন মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের প্রভঅবে। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মূলত পুঁজিবাদি শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক শ্রেণিবৈষিম্যহীন অর্থণৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে সংবিধানে এ মূলনীতি যোগ করেন। দুঃখী, দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘবেই মূলত এ প্রচেষ্টা।

গণতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যাঃ

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বরের অনন্য ভাষণে বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছিলেন,

'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আমরা আগেও দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে আছে, দেখা যায় সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের প্রটেকশন দেয়ার কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্য গণতন্ত্রের ব্যবহার"।

বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্র ছিলো শোষিতের গণতন্ত্র। শোষক শ্রেণিকে রক্ষা করার জন্য নয়। তার রাজনৈতিক আদর্শ ছিল একটি গনমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং জণগণের বাছাই করা প্রতিনিধি দ্বারাই দেশ শাসন।

১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন,

"শাসনতন্ত্রে লিখে দিয়েছি যে, কোনো দিনও শোষকেরা বাংলার মানুষকে করতে পারতেন না। দ্বিতীয় কথা আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জনগণের ভোটে জনগণের প্রতিনিধিরা দেশ চালাবে, এর মধ্যে কারও কোনো হাত থাকা উচিত নয়।....."

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে, কীভাবে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পরিচালিত হবে তার রূপরেখা প্রদান করেছেন। বর্তমানে আইনের শাসন বলতে আমরা যা বুধি এবং যাকে গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ বলি, বঙ্গবন্ধু এ বক্তব্যে আইনের শাসনের চমৎকার দর্শন অন্তর্নিহিত আছে। তিনি গণপ্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের কথাই বলেছেন।

বস্তুত, বঙ্গবনধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূরক এ গণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সেই সময়ে এ পদক্ষেপ ছিল বঙ্গবন্ধুর দূল দৃষ্টি সম্পন্ন ও সাহসী রাজনৈতিক দর্শনেসর বাস্তব রূপ। জনগণের প্রতি গভীর, অকৃত্রিম ভালোবাসাই এর মূল কারণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনঃ

বঙ্গবন্ধুর রাজণৈতিক দর্শন গড়ে উঠার পেছনে মানুষের জন্য তার অকৃত্রিম ভালোবাসা কাজ করেছে। তিনি দেখেছেন কীভাবে বছরের পর বছর ব্রিটিশরা এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকেরা বাংলার মানুষের অধিকার হরণ করেছে, বাঙালিদের শোষণ-অত্যাচার করেছে। ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে জনস্রোত এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ– এ প্রতিটি ঘটনাইট তার মাঝে একটি

গণমুখী, জনকল্যাণকর রাজনৈতিক দর্শন গড়ো তোলার পেছনে কাজ করে। আর সেই রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তবরূপ হিসেবে ১৯৭২ সালের সংবিধান আমরা পাই।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। বঙ্গবন্ধু বারবার বলতেন,

"ব্রিটিশরাজ ভারতকে স্বাধীনতা দেয়নি। স্বাধীনতা রামে তাদের ট্রেনিং দেয়া সিভিল সার্ভেন্টদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেছেন। রাজনীতিকরা এদের হাতের পুতুল মাত্র".....।

ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর পাকিস্তানি শাসকেরা এদেশের মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করে। তারা আমাদের মাতৃভাষা কেড়ে নিতে চায়। জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা। পরবর্তীতে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা করেও তাকে দমানো যায়নি। কারণ তিনি একটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বুকে লালন করত। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তিনি ডাক দেন স্বাধীনতার।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

তার এক ডাকেই মানুষ যার যা কিছু আছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নয় মাস যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। পৃথিবীর অন্য কোনো নেতা হয়তো জনগণের এত ভালোবাসা পায়নি। আর এর কারণ ছিল তিনি নিজে বাংলার মানুষকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তার রাজনীতি ছিল বাংলার মানুষের জন্য। নিজের চোখে তিনি বাঙালির উপর নির্যাতন, অন্যায় হতে দেখেছেন। তাই তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল সুস্পষ্টতই জনগণকে আত্মনির্ভরশীল কতে এবং বাংলাদেশকে একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে। তার রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও জনগণের জন্য তার ভালোবাসা থেকেই তার রাজনৈতিক দর্শনগুলো গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। এরই ফলস্বরূপ আমরা একটি যুগোপযুগী ও সাহসী সংবিধান পেয়েছিলাম।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও বর্তমান বাংলাদেশের এর প্রভাব এর গুরুত্বঃ

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালে কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাঙালি জাতির জন্য একটি দূর্ভাগ্যজনক অধ্যায়, লজ্জার অধ্যায় হলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। তার রাজনৈতিক দর্শন বাঙালি জাতিকে একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ উপহার দেয়ার প্রত্যয়ে প্রথিত ছিলো। কিন্তু তাকে হত্যা করা হয় এবং পরে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী শক্তিগুলোকে পরাজিত করতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন আমাদের জন্য অপরিহার্য।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনগুলোর মাঝে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিপেক্ষতা অন্যতম। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এদের আলোচনা করা হলো:

বর্তমান বাংলাদেশ ও গণতন্ত্র:

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করার পর এদেশে আবারো সামরিক শাসন কায়েম করা হয়। আবার শুরু হয় জনগণের উপর শোষণ। নামমাত্র ভোটাধিকার দিয়ে জনগণকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাঙালি দমে যায়নি। ১৯৯১ সালে আবারো বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতি ৫ বছর পর পর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনগণ তাদের ভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন যেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মোতাবেক শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। শাসক ও আমলারা যেন গণতন্ত্রকে নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার করতে না পারে। মানুষ যেন সর্বোচ্চ সুফল পেতে পারে গণতন্ত্রের।

বর্তমান বাংলাদেশ ও সমাজতন্ত্র:

বঙ্গবন্ধু একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাস করতেন। কারণ তিনি সমাজের অবহেলিত কৃষক, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র নেই। মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা চালু আছে, সময়ের প্রয়োজনেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন সমাজের অবহেলিত শ্রেণিকে তাদের যোগ্য সম্মান দিতে। খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিভিন্ন ভাতা, কর্মসূচি ইতিমধ্যে চালু আছে। পাশাপাশি আমাদের দায়িত্ব হলো মন থেকে শ্রেণিবৈষম্যকে ঘৃণা করা ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

বর্তমান বাংলাদেশ ও ধর্মনিরপেক্ষতা:

১৯৭৫ সালে পাকিস্তানি মদদপুষ্ট ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা তৈরি সংবিধান থেকে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মুছে ফেলে আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে যে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ ফেলেছেন তা থেকে এখনও আমরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে ধর্মনিরপেক্ষতা সসহ চারটি মূলনীতি ফিরিয়ে আনলেও এখনও আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের মতো কলঙ্কিত বিষয় রয়েছে। এগুলো মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে উৎসাহিত করছে।

আজও বাংলাদেশে ধর্মের নামে নির্যাতন, হানাহানি, সন্ত্রস, বোমাজাবি, রক্তপাত হয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের সঠিক চর্চা থাকলে আজ এসব আমাদের দেখতে হতো না। তাই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের চর্চা করা, এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, আমাদের জাতীয় জীবনে এগুলোর প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলার মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা, তার ত্যাগ, তার দর্শনে বিমোহিত হয়ে লেখক অন্ন দাশঙ্কর রায় বলেছিলেন,

"যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা, গৌরী মেঘনা বহমান ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান, দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা রক্তগঙ্গা বহমান, তবু নাই ভয় হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান।"

বর্তমান বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়সমূহঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান বাংলাদেশেও তার রাজনৈতিক দর্শনগুলো বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধখতার মুখোমুঝি হতে হয়েছে। প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধখতা হলো স্বাধনিতাবিরোধী অশুভ শক্তি, যারা কখনোই চায়না এ দেশের মানুষের কল্যাণ হোক, মানুষ ভালো থাকুক এবং বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়িত হোক। এরা শুধু জনগণকে শোষণ করতে চায়। দ্বিতীয়ত, মৌলবাদ ও সাম্প্রাদায়িকতা। এরাও বঙ্গবন্ধুর জনমুখী দর্শনের পরিপন্থী। এরা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে মানুষের অনুভূতি নিয়ে খেলে। সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। তৃতীয়তা, ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজ নেতা ও আমলারা। বঙ্গবন্ধু কখনোই ব্রিটিশ ভারতের মতো সকল ক্ষমতা আমলাদের হাতে কুক্ষিগত হোক এবং জনগণের কাজ করার পরিবর্তে জনগণের প্রতিনিধি বা নেতা জনগণের টাকই মেরে চলুক এমন চাননি। বর্তমান বাংলাদেশেও আমরা ও নেতাদের ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, রাষ্ট্রের কল্যাণ পরিপন্থি কাজগুলো বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের ও দর্শনের বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। এছাড়াও আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক বিষয়ে অনাগ্রহ, অসচেতনতা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে না জানাও তার মহান রাজণৈতিক বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক। এখন সময় হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের। কারণ তার দর্শন ছাড়া বাংলার শোষিত মানুষরা কখনোই সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করবে না অন্যায় অত্যাচার থেকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দর্শনগুলো বাস্তবায়নে অনেকগুলো উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে এর সাথে আমাদের নিজেদের কিছু দায়িত্ব–কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত, আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী, তার দর্শন, তার আদর্শ, কার্যাবলি, ত্যাগ তিতিক্ষার কথা খুব ভালোভাবে জানতে হবে। তাহলে আমাদের রাজনতিক সচেতনতা বাড়বে, দেশের মানুষও দেশের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং তার দর্শন দ্বারা আমাদের অন্তরাত্মা অনুপ্রাণিত হবে।

তার দর্শন বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত হবে। দ্বিতীয়তা, বঙ্গবন্ধুর মানবিক ও ব্যক্তিজীবনের গুণাবলিগুলো নিজেদের মাঝে ধারণ করতে হবে। সততা, দয়া, সময়ানুবর্তিতা, ন্যায়বোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, মানুষের সাহায্য করাসহ অনেক মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ গুণগুলো আমাদের মাঝে থাকলে আমরা আদর্শ মানুষ হব এবং এতে দেশের কল্যাণ হবে। তৃতীয়ত, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে যেন এমন কাজ করার সাহস কেউ না পায়। সর্বোপরি ছোটোবেলা থেকেই আমাদের নিজেদের মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনগুলো ও তার গুণাবলিগুলো ধারণ করতে হবে তাহলেই এগুলোর বাস্তবায়নে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরা বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে হত্যা করেছে কিন্তু তার চেতনা, তার দর্শন, তার আদর্শকে কখনোই হত্যা করা সম্ভব নয়। তার রাজনৈতিক দর্শন ধারণ করে বাঙালি এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হবার চেষ্টা করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তার বাবার দর্শণ, স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। সোনার বাংলা গড়ায় তিনি দৃঢ় সংকল্প। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের, দর্শনের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, উন্নতিতে দৃঢ় সংকল্প জনন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নে বর্তমান বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তর কর্মসূচি নিয়েছেন। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ হলো:

(১) উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোনো দুইটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এর চেয়ে অনেক বেশি, ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৫ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দশমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ। [সূত্রঃ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)]

(২) বাংলাদেশের অর্জনসমূহঃ

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের অগ্রযাত্রায়। জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কীভাবে বাংলাদেশ দ্রুতগতি সম্পন্ন স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু–১ উৎক্ষেপন করলো তা অবিস্মরণীয় ঘটনা ও গর্বের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, MDG অর্জন, শিক্ষা–স্বাস্থ্য-কৃষিতে উন্নতি, গড় আয় বৃদ্ধি, পোশাক শিল্প, ১০০টির বেশি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা তো রয়েছেই। এছাড়াও প্রাকৃতি দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ, দারিদ্র হ্রাস, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্জনসমূহের মাঝে অন্যতম।

(৩) শিক্ষাখাতে অর্জনঃ

শিক্ষার মানউন্নয়ন ও সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গৃহিত কিছু পদক্ষেপ হলো–বিনামূল্যে বই বিতরণ, নারীদের প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি দেয়া, ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও সংখ্যা বাড়ানেই ইত্যাদি। ১৯৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৬১ বর্তমানে তা ৯৭.৭ ভাগা। এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট"। [সূত্রঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর]।

(৪) নারীর ক্ষমতায়নঃ

বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে সফল। পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্ব অন্যতম। আর এ শিল্পের সিংহভাগই নারী কর্মী। ক্ষুদ্রঋণও এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে নারী উদ্যোগতাদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছে।

(৫) স্বাস্থ্যখ্যাতে সাফল্যঃ

স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযুগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা–২০১১"। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। শিশুদের টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ। ১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়, মেডিকেল কলেজ ও জেরঅ হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ২০০০ এরও বেশি শয্যায়। এছাড়াও মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস সম্ভব হয়েছে।

(৬) কৃষিখাতে উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনঃ

বাংলাদেশ ১৬ কোটির বেশি মানুষের দেশ। তবুও বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ যা আমাদের অন্যতম সফলতা। বিগত বছরগুলোতে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিস্কার করেন পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং। এছাড়াও কৃষকদের কীটনাশক ও সার বিতরণ, আর্থিক সহায়তা, ঋণ ইত্যাদি সরকারের গুরুত্ব পূর্ণ পদক্ষেপ।

(৭) শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উন্নয়নঃ

বাংলাদেশে এখন শুধু পোশাক শিল্পই নয় ওষুধ, জাহাজ, আবাসন ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্র শিল্পের প্রসার ঘটেছে। রপ্তানি খাতে যোগ হয়েছে জাহাজ, ওষুধ ইদ্যাদি। বাংলাদেশের আইটি শিল্পও বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশের আইটি শিল্প ১০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে গেছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তায় সরকার খেয়াল রাখছে।

(৮) ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনঃ

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে নিয়েছে যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ। দেশের ৪৫৫০ টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়ে এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সব উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নীত ঘটায় এখন বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লক্ষেরও বেশি। রয়েছে ই-পেমেন্ট মোবাইল ব্যাংকিং। ৫-জি প্রযুক্তির কাজও চলছে।

(৯) সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহঃ

বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নের স্বপ্নের পদ্মাসেতুর কাজ প্রায় শেষ। বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রোরেলের কাজও চলছে দ্রুতগতিতে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি প্রকল্পের কাজও চলছে পুরোদমে। এমন আট মেগা প্রকল্প এগিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশকে। এছাড়াও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প অন্যতম। দ্রুত সময়ের মাঝে এগুলোর উদ্বোধনের ও ব্যবহারের জন্যও সরকার অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছে যা বাংলাদেশকে নিবে উন্নতির অনন্য শেখরে ও মানুষের কষ্ট লাঘব হবে। বাংলাদেশ গরীব-দুঃখী সহ সকল মানুষের আশা-ভরসার স্থল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধুর সযোগ্য কন্যা হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা হিসেবে হাজারও বাধা অতিক্রম করে, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য

করে তার দৃষ্টি, বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাই দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই মুজিব দর্শন বাস্তবায়ন সম্ভব।

বাংলাদেশের সংবিধানের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আমাদের চিন্তা-চেতনায়, কাজ-কর্মে ও জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তাহলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়িত হবে।

উপসংহার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বিশ্বের একজন অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি শোষিত, নিপীড়ি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা। তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কথা ভবতেন। তার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সমাজের শ্রেণির বিভেদ দূর করতে চেয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশকে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি তার সম্মোহনী গুণ দ্বারা এবং রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তব রূপ হিসেবে ১৯৭২ সালে অতি অল্প সময়ের মাঝেই বাংলাদেশকে একটি সংবিধান উপহার দিয়েছিলো। বর্তমান বাংলাদেশে যে মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি রয়েছে, বঙ্গবন্ধু থাকলে এগুলো কখনেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারত না। রাজনীতিতে ধর্মীয় উস্কানি, সাম্প্রদায়িকতার মতো অশুভ জিনিসগুলো বাংলার মাটিতে ঠাঁই পেত না। আশার আলো হিসেবে আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলার মাটি থেকে এ অশুভ শক্তিগুলো উৎখাতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর দর্শনগুলো আমাদের মতো তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই আমরা একদিন বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলব।